মায়া মায়াবিনী

প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণা

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব গান গাইতেন, ''এমনি মহামায়ার মায়া, রেখেছ কি কুহক করে।'' কুহকিনী মায়ার সম্মোহনে আচ্ছন্ন হয়ে আমরা জন্ম থেকে জন্মান্তরে ঘুরে বেড়াই। চোখে মিথ্যার বাঁধন, বাঁধন খোলার কোনও চেষ্টা না করে শোকে দুঃখে জর্জরিত হয়ে দিনযাপন করে চলি। বন্ধনে যে জড়িয়ে আছি—সে-চেতনাও হয় না। পরমপূজনীয়া শ্রদ্ধাপ্রাণামাতাজীর কাছে একটি ঘটনা শুনেছিলাম। মাতাজী কাহিনিটি বলেছিলেন একটি ছাত্রীসম্মেলনে। তিনি যে-কলেজে পড়াতেন তার পাশে ছিল একটি শিশুকন্যাদের বিদ্যালয়। স্বাভাবিকভাবেই মাস্টারমশাই আসার আগে তাদের কলরব স্কুলের সীমানা ছাড়িয়ে আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ত। প্রতিদিন ক্লাসে ঢুকে শিক্ষকমশাই অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলতেন, ''দেবিয়োঁ গৌরিয়োঁ মুখকমল বন্ধ কিজিয়ে।'' কোলাহল যেদিন চরমে উঠত, সেদিন বৃদ্ধ শিক্ষক অত্যন্ত বিরক্তিতে ধমক দিতেন, ''চণ্ডিকে চামুণ্ডে মুখবিবর বন্ধ কিজিয়ে। চুরাশি লক্ষ্ যোনিকে পশ্চাত ইয়ে মনুষ্য জনম ক্যা চিল্লা চিল্লা কর বিতা দেঙ্গে?'' অত্যন্ত মজাদার, নাটকীয় ভঙ্গিতে ঘটনাটির বর্ণনা করে মাতাজী ছাত্রীদের উদ্দেশে বললেন, ''তোমাদেরও একই কথা বলছি। রেখে ঢেকে নয়, খোলাখুলি, স্পষ্টভাবে। চুরাশি লক্ষ জন্মের পর পাওয়া এই মনুষ্যজন্ম যেন বৃথা না যায়।'' মানুষজন্মের পরমলক্ষ্যে পৌঁছতে হবে—এই আকাঙ্ক্ষার আগুন মাতাজী জ্বেলে দিতে চেয়েছিলেন কিশোরীদের মনে। কোথায় আছি, কেমন আছি সে-বিষয়ে প্রথমে তো সচেতন হতে হবে, প্রথমে তো বুঝতে হবে যে আমি বন্ধনে আছি, তবেই না বাঁধন ছেঁড়ার ইচ্ছে মনে জাগবে! মায়াকে আগে চেনা চাই, আগে জানা চাই তাঁর সম্মোহিনী শক্তির ব্যাপ্তিকে। তাঁকে চিনতে পারলে তিনি নাকি হেসে পথ ছেড়ে দেন, আর তখনই আলগা হয় বন্ধন, খসে যায় মিথ্যা পরিচিতির আবরণ। মেঘমুক্ত সূর্য ঝলমল করে আর আমরা নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হই।

মায়ার গতিপথ অনুসরণ করতে গেলে আমাদের ভারতবর্ষের প্রধান ধর্মগ্রন্থ তথা শাস্ত্রগ্রন্থ বেদের আশ্রয় নিতে হবে। স্বামীজী বেদকে অনন্ত জ্ঞানরাশি বলেছেন। বেদের সারভাগ হল বেদান্ত। ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব—এই চার বেদের প্রত্যেকটিকে মন্ত্র বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ—এই চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে সংহিতা ও ব্রাহ্মণকে বলা হয় কর্মকাণ্ড। বিভিন্ন

যাগযজ্ঞের ক্রিয়াপ্রণালী, মন্ত্রগুলির সংকলন ইত্যাদি আমরা পাই কর্মকাণ্ডে। স্বর্গলাভ ইত্যাদি অলৌকিক ফল এবং ধনরত্ন, সম্পদ ইত্যাদি জাগতিক ফল পাওয়ার জন্য এসব যাগযজ্ঞ করা হত। অন্যদিকে আরণ্যক এবং উপনিষদকে বলা হয়েছে জ্ঞানকাণ্ড। যাঁরা গার্হস্থ্যজীবন যাপনের পর বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছেন, যাঁরা অরণ্যবাসী, বয়োবৃদ্ধ, তাঁদের পক্ষে যাগযজ্ঞ করা কঠিন ছিল। ফলে ধ্যান, মনন, উপাসনাই তাঁদের কৃত্য হত। এই দীর্ঘ মননচর্চার ফলশ্রুতি হল উপনিষদ। উপনিষদে প্রকাশিত হয়েছে আরও মার্জিত, উন্নত জ্ঞানভাণ্ডার। কালের বিচারে উপনিষদ এসেছে সবার শেষে, বেদের অন্তে আছে উপনিষদ। আবার উপনিষদের মধ্যে বেদের সারভাগ প্রকাশিত হয়েছে। তাই উপনিষদভিত্তিক দর্শনকে বলা হয় বেদান্ত দর্শন।

'উপ' শব্দের অর্থ নিকটে, 'নি' শব্দের অর্থ হল সুনিশ্চিতভাবে আর 'সদ্' শব্দের অর্থ বিনাশ করা। যে-বিদ্যা সুনিশ্চিতভাবে এই সংসারবন্ধন বা মায়ার বন্ধনের বিনাশ ঘটায় তা-ই হল উপনিষদ। সেযুগে লেখার চল ছিল না। কেবল শুনে শুনে, গুরুশিষ্য পরম্পরায় এই বিদ্যা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে বাহিত হত। তাই এই বিদ্যার অপর নাম শ্রুতি।

এই ঔপনিষদিক চিন্তার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ রূপ হল অদ্বৈতবাদ। মহামায়ার কুজ্ঝটিকা স্বরূপ, জালবিস্তার প্রণালী এবং তাকে গুটিয়ে এনে সমূহ বিনাশ করার পদ্ধতি আমরা খুঁজে পাই এই অদ্বৈত-বেদান্তে। অদ্বৈতবেদান্তের সঙ্গে যাঁর নাম সবথেকে বেশি জড়িয়ে আছে, তিনি শংকরাচার্য। তবে অদ্বৈতবাদের আবির্ভাব কিন্তু শংকরের আগেই হয়েছিল। শংকরাচার্যের গুরু হলেন গোবিন্দপাদ, তাঁর গুরু গৌড়পাদ। এই গৌড়পাদই প্রথমে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য অদ্বৈতকারিকা বা মাণ্ডুক্যকারিকা রচনা করেন। শংকরাচার্য গৌড়পাদের কাছে বারবার ঋণ স্বীকার করেছেন। তবে অদ্বৈতবাদের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ আচার্য শংকরের দর্শনেই পাওয়া যায়।

অদ্বৈতবাদের সারকথা শংকর মাত্র অর্ধশ্লোকে প্রকাশ করেছেন। 'শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ'—কোটি কোটি গ্রন্থে যে-সত্যকে প্রকাশ করার আকুল প্রয়াস আমরা দেখতে পাই, অত্যন্ত সংক্ষেপে তার সারনির্যাস হল : ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব এবং ব্রহ্ম অভেদ।

কিন্তু এই জগতকে মিথ্যা বলে আমরা কেউ ভাবতে পারি কি? ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষগ্রাহ্য এই জগৎ আমাদের কাছে সত্যের চেয়েও সত্য, কারণ তা আমরা অনুভব করছি। বাবা-মার স্নেহের বিকল্প কোথায়? অকৃত্রিম, স্বার্থশূন্য বন্ধুত্বকে মিথ্যা বলি কোন যুক্তিতে? শিশুসন্তানের নিষ্পাপ হাসি, তার আধো বুলি আমাদের যে-স্বর্গীয় সুখের সন্ধান দেয় সে কি কখনও মিথ্যা হতে পারে? অসংখ্য বন্ধনমাঝে আমরা মুক্তির স্বাদ খুঁজি। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা দেখব আদৌ তা বোধহয় সম্ভব হয়ে ওঠে না। বন্ধন এবং মুক্তি যে পরস্পর বিপরীত! যখন কেউ অনুভব করতে পারে—''সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়/ জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারই শিখায়/ তোমারই মন্দির মাঝে''—তখন যে-ভূমানন্দের স্বাদ তাকে পূর্ণ করে সেই অনুভূতির সন্ধানেই তো সাধকের সাধনা, ক্ষুদ্র অহং আর আসক্তির বন্ধন থেকে মুক্তির সাধনা। কিন্তু যতক্ষণ মোহিনী মায়ার অপরূপ চিত্রিত, কারুকার্যখচিত জালটি আমাদের জড়িয়ে থাকে ততক্ষণ কোথায় মুক্তি? বসুধার মৃত্তিকাপাত্রে অমৃতজ্ঞানে যে-বারি পান করতে চাই তা আদৌ অমৃতের আনন্দ দেয় কি? বারে বারে মৃৎপাত্র ভেঙে সে-বারি ছড়িয়ে যায় ভূমিতে, কখনও বা গরলের জ্বালায় জ্বলে উঠি। মায়াশক্তির প্রচণ্ড প্রভাবে আমরা বুঝি না, জানি না যে মিথ্যায় বেঁচে আছি, এ-জগৎ মিথ্যা। কখনও শোকের

দুঃসহ ঝঞ্ঝাবাতে যবনিকা প্রবল হাওয়ায় সরে সরে যায় আর সত্যসূর্যের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয় চেতনা, কিন্তু সেও ক্ষণিকের জন্য। এই বিভ্রান্ত চেতনাকে সত্যস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই অদ্বৈতবেদান্ত মহামায়ার কার্যপ্রণালীর বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন।

মহামায়ার প্রভাবে আমরা ভুল দেখি, ভুল জানি, ভুল চিনি। এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলে জানার শাস্ত্রীয় নাম হল 'অধ্যারোপ'। ''অসর্পভূতায়াং রজ্জৌ সর্পারোপবৎ বস্তুনি অবস্তু-আরোপঃ অধ্যারোপঃ।'' একটা দড়িকে যখন সাপ বলে ভুল করি তখন সত্য রজ্জুতে যেমন সর্পের আরোপ হয় ঠিক তেমনই একমাত্র সদ্‌বস্তু ব্রহ্মাতে অবস্তু জগতের আরোপই হল অধ্যারোপ। ''বস্তু সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং ব্রহ্ম। অজ্ঞানাদি জড়সমূহঃ অবস্তু।'' সচ্চিদানন্দ অদ্বয় ব্রহ্মাই বস্তু, অন্য সবকিছুই জগতে অবস্তু। ব্রহ্মকে জগৎ বলে ভ্রম হয় মায়ার প্রভাবে। ঠিক যেন জাদুকরের ভেলকি। জাদুকর শূন্য থেকে গাছ তৈরি করে, সেই গাছে ফল ফলে, সেই ফল খেয়ে আমাদের মিষ্টিও লাগে। আবার হাততালি দেয় জাদুকর, সব মিলিয়ে যায় হাওয়ায়। গাছ নেই, ফল নেই, শূন্য মঞ্চে একলা বাজিকর দাঁড়িয়ে থাকে।

ঠিক তেমনই মহামায়ার ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রভাবে আমরা আমাদের মৃত্যুঞ্জয় আনন্দস্বরূপকে ভুলে গিয়ে জন্মমৃত্যুর চক্রে, সুখদুঃখের ঘূর্ণিতে আবর্তিত হতে হতে দিন কাটাই। সুখের জন্য ঘর বাঁধি, অনলে দগ্ধ হয়ে যায়। অমিয় সাগরে স্নান করতে চলি, গরলের জ্বালা এড়াতে পারি না। দুঃখমুক্তির জন্য যেদিকে হাত বাড়াই সেটাও তো এই জগৎ। ভ্রম থেকে আরও ভ্রম, মহামায়ার মোহপাশ অনায়াসে আমাদের সবলে বদ্ধ করে। ''পড়ে মা তোর মায়ার ফাঁদে, কত নরনারী কাঁদে।/ তোর মায়াজাল ততই বাঁধে পালাতে চাই যতই ধেয়ে।/ জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছিস মা।'' এই হল অধ্যারোপ। আর যেদিন মায়াদেবী পথ ছেড়ে দাঁড়ান সেদিন হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে এক লহমায় সহস্র সূর্য জ্বলে ওঠে। মিলিয়ে যায় জগৎ, মিলিয়ে যায় সুখদুঃখে ঘেরা অসংখ্য অনন্ত অভিনয়। জেগে থাকি একমাত্র আমি, সচ্চিদানন্দ অদ্বয় ব্রহ্ম। এই চেতনার পারিভাষিক নাম 'অপবাদ'। বন্ধন আর মুক্তি, অধ্যারোপ আর অপবাদ, এই নিয়েই চলে মায়ের খেলা, মায়ার খেলা।

জগৎসম্মোহিনী মায়া দুভাবে কাজ করেন। প্রথমে তিনি আবৃত করেন, ঢেকে দেন বস্তুর যথার্থ স্বরূপকে। তারপর সেই আবরণে প্রক্ষিপ্ত হয় ভিন্ন কোনও ছবি। মায়ার এই দুই ক্রিয়াশক্তির নাম আবরণ এবং বিক্ষেপ। এই দুই মহাশক্তির ক্ষমতা বিপুল। চেতনার বিভ্রান্তিতে নিজে যা নই, তা-ই নিজের সম্বন্ধে ভাবতে বসি। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে পাই, ''জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবি ভগবতী হি সা।/ বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥'' স্বামী বিবেকানন্দ সুন্দর একটি গল্প বলেছেন। নারদ শ্রীকৃষ্ণের কাছে একদিন জানতে চেয়েছিলেন— ''তোমার মায়া কী এবং কেমন, যদি একবার জানাও প্রভু!'' একদিন তাঁরা দুজনে বেড়াতে যান। তৃষ্ণার্ত নারায়ণ নারদকে জল আনতে বলেন। কাছের গ্রামে জল আনতে গিয়ে নারদ একটি পরমা সুন্দরী কন্যাকে দেখে মুগ্ধ হন, তার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে যায় এবং তাঁদের কয়েকটি সন্তানসন্ততিও হয়। ক্রমে দীর্ঘ বারো বছর কেটে যায়। হঠাৎ বহু বছর পরে নদীতে ভীষণ বন্যা দেখা দিল। সেই বন্যায় ভেসে গেল একে একে নারদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা। হাহাকার করতে করতে নারদ ঢেউয়ের আঘাতে আছড়ে পড়লেন তীরে, আর তখনই শুনতে পেলেন মধুর কণ্ঠ—''নারদ, আমার জল কই? আধঘণ্টা হয়ে গেল যে?'' মাত্র আধঘণ্টা? তবে যে মনে হয়েছিল এক যুগ? এটাই মহামায়া? এমন বিভ্রান্তি? নারদ প্রার্থনা করেন, ''হে প্রভু, যেন

তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় আর মুগ্ধ না হই।" পরমভক্ত আকুমার ব্রহ্মচারী নারদ তাঁর স্থান, কাল, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য সব বিস্মৃত হয়ে গেলেন আবরণী শক্তির প্রভাবে আর বিক্ষেপ শক্তির মনোমুগ্ধকর মায়ার ছবি তাঁকে বদ্ধ করল মোহজালে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, ''এই মায়া বা অহং যেন মেঘের স্বরূপ। সামান্য মেঘের জন্য সূর্যকে দেখা যায় না—মেঘ সরে গেলেই সূর্যকে দেখা যায়। আড়াই হাত দূরে শ্রীরামচন্দ্র, যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, মধ্যে সীতারূপিণী মায়া ব্যবধান আছে বলে লক্ষ্মণরূপ জীব সেই ঈশ্বরকে দেখতে পান নাই। এই দেখ, আমি এই গামছাখানা দিয়ে মুখের সামনে আড়াল করছি। আর আমায় দেখতে পাচ্ছ না। তবু আমি এত কাছে। সেইরূপ ভগবান সকলের চেয়ে কাছে, তবু এই মায়া আবরণের দরুন তাঁকে দেখতে পাচ্ছ না।" আবার বলছেন, ''জীব তো সচ্চিদানন্দস্বরূপ কিন্তু এই মায়া বা অহংকারে তাদের সব নানা উপাধি হয়ে পড়েছে, আর তারা আপনার স্বরূপ ভুলে গেছে।"

অদ্বৈতবেদান্তের মূল আকরগ্রন্থ তিনটি—উপনিষদ বা শ্রুতিপ্রস্থান, ব্রহ্মসূত্র বা ন্যায়প্রস্থান এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বা স্মৃতিপ্রস্থান। বিভিন্ন ঔপনিষদিক সত্যগুলির মধ্যে যে-ঐক্য আছে তা প্রতিষ্ঠা করবার জন্যই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস রচনা করেন ব্রহ্মসূত্র। অপরদিকে গীতা হল সমস্ত উপনিষদের সার। বেদান্তের মূলতত্ত্বগুলি অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে শ্রীভগবান জগতের কল্যাণের জন্য অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে বুঝিয়ে গেছেন। স্মৃতিপ্রস্থানের একটি আকরগ্রন্থ যদি গীতা হয় তাহলে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'কে অপর একটি আকরগ্রন্থ বলাই যায়। বেদান্তের এমন সহজ সাবলীল ব্যাখ্যা আর কোথাও পাওয়া যায় না। ঘরোয়া ভাষায়, অত্যন্ত চেনা উপমার সাহায্যে বেদান্তের দুরূহ তত্ত্বগুলি এমন সহজভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, যার তুলনা মেলে না।

মায়ার সংজ্ঞা দিয়েছেন সদানন্দ যোগীন্দ্র তাঁর বেদান্তসার গ্রন্থে। মায়াকে আছে বলা যায় না, নেইও বলা যায় না। মায়া অনির্বচনীয়। মায়া কী তা মুখে বা বচনের দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব। রাজর্ষি জনক এক রাতে ঘুমিয়ে আছেন পালঙ্কে, হঠাৎ প্রহরী তাঁকে ডাকল—''মহারাজ, ভয়ানক বিপদ! আমরা শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি।" জনক সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধে চললেন, কিন্তু যুদ্ধে জয়ী হতে পারলেন না। শত্রু রাজা তাকে হত্যা করলেন না ঠিকই, কিন্তু রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করলেন। রাজা চলেছেন নিজের রাজ্যের রাজপথ ধরে, তাঁর নিজের প্রজারাই এগিয়ে আসছে না নতুন রাজার ভয়ে। ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, নিরাশ্রয় রাজাকে দেখেও সন্তানসম তাঁর প্রজারা মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিতে লাগল। অবশেষে রাজ্য পেরিয়ে প্রতিবেশী রাজ্যের সীমানায় এসে দেখলেন একটি লঙরখানায় দীনদুঃখীদের অন্নদান করা হচ্ছে। সেখানে ভিখারিদের পিছনে রাজা সারি দিয়ে দাঁড়ালেন, একটি মৃৎপত্রে অবশিষ্ট সামান্য আহার্য পেলেনও। কিন্তু যখন খাবার মুখে তুলতে যাচ্ছেন তখন একটি চিল উপর থেকে দ্রুতবেগে উড়ে এসে ছোঁ মেরে ফেলে দিল সেই মাটির ভাঁড়টি। সামান্য আহার ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। রাজা ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে হতাশায় ক্রন্দন করে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন। আর তখনই তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। ঘামে ভিজে গেছে সমস্ত শরীর। প্রহরী ছুটে এল—''মহারাজ, আপনি চিৎকার করে উঠেছিলেন, আপনি ঠিক আছেন তো?" রাজা প্রহরীর দিকে চেয়ে শুধু বললেন, ''এটা সত্য, নাকি ওটা সত্য ছিল?" প্রহরী হতচকিত হয়ে ডাকল অন্যান্যদের। একে একে এল অনেকেই, রাজার মুখে সেই এক কথা। পরদিন রাজসভায় এসে বসলেন রাজা, কিন্তু সভাকাজে তাঁর মন নেই। মুখে শুধু একটিই কথা,

''এটা সত্য নাকি ওটা সত্য?'' সবাই ভাবল, রাজার কোনও মানসিক রোগ হয়েছে বোধহয়। এই সময়ে নগরে এলেন অষ্টাবক্র মুনি। তিনি জনকের গুরু; অন্তর্যামী ঋষি। রাজার কাছে সভায় উপস্থিত হলেন অষ্টাবক্র। বিষণ্ণ রাজা তাঁকেও একই প্রশ্ন করলেন। ঋষি বললেন, ''মহারাজ যখন আপনি হতাশায়, ব্যর্থতায় ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছিলেন, তখন আজকের এই সম্মান, প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য আপনার কাছে ছিল কি?'' ''না''—উত্তর দিলেন জনক। ''এখন এই রাজসভায় সেই পরাজয়ের কোনও অস্তিত্ব আছে কি?'' ''না, নেই।'' ''তাহলে মহারাজ সেও সত্য নয়, এও সত্য নয়।'' তাহলে বাকি থাকে কী? ঋষি প্রশ্ন করেন, ''মহারাজ, সেই ভয়ানক স্বপ্নের সময় আপনি ছিলেন কি?'' ''ছিলাম ঋষিবর।'' ''আর এখন?'' ''এখনও আছি।'' ''তাহলে আপনিই অপরিবর্তিত, সত্য। বাকি দুটি অভিজ্ঞতার কোনওটিই সত্য নয়।'' বদলে যাচ্ছে স্বপ্ন, বদলে যায় জগৎ। স্বপ্নের জগৎ বা ভ্রমের জগৎ হল প্রাতিভাসিক সত্তা, এই আছে, এই নেই। জগৎ হল ব্যাবহারিক সত্তা যা ব্রহ্মজ্ঞানের পর আর থাকে না। মায়ার খেলার বিক্ষেপ এই দুই সত্তাকে আছে বলা যায় না, নেইও বলা যায় না। যখন অনুভব করি তখন বড় তীব্রভাবে আছে আর যখন হারিয়ে যায় তখন এক নিমেষে পার্থিব জগৎ শূন্য হয়ে যায়। তখন জেগে থাকে 'আমি', জেগে থাকে ''একমাত্র যেবা, যেবা সর্বময়/ যাহা বিনা কোনো অস্তিত্বই নয়।'' এই সত্তাই আমার পারমার্থিক সত্তা যা মায়ামুক্ত, সদানন্দস্বরূপ।

স্বামীজী বড় সুন্দরভাবে এই মায়ার ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলছেন, ''সূক্ষ্মতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের দৈনন্দিন স্থূল কার্য পর্যন্ত আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, আমাদের সমস্ত জীবনই এই সৎ ও অসৎ রূপ বিরুদ্ধ ভাবের সংমিশ্রণ।'' কতগুলি বিরুদ্ধ ভাবের দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন। আমাদের জীবনের প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাস আমাদের স্বার্থপর হতে বলছে অথচ অন্য এক অমানুষী শক্তি বলছে, শুধু নিঃস্বার্থতাতেই মঙ্গল। সমস্ত সংসার মৃত্যুর দিকে ছুটে চলেছে। বিলাস, ঐশ্বর্য, জ্ঞান—সবকিছুরই শেষ মৃত্যু। অথচ জীবনের প্রতি আমাদের তীব্র আসক্তি। এই বিরুদ্ধ ভাবই মায়া। সংসারগতির বর্ণনার নামই হল মায়া। যেখানে সুখ, সেখানেই দুঃখ। যেখানে অমঙ্গল সেখানেই মঙ্গল। যেখানে জীবন সেখানেই ছায়ার মতো মৃত্যু। এই প্রকৃতি বা জগৎপ্রপঞ্চই মায়া।

এই প্রাকৃত জগতে সুখের খোঁজে হাত বাড়িয়ে দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনও উপায় নেই। ''পক্ষহীন শোনো বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার।'' মুক্তির সন্ধানে যেতে হবে প্রকৃতির পারে। এই মায়ার জগৎ বা ভ্রমের জগৎ আমাদের ভ্রম থেকে কখনও উদ্ধার করতে পারে না। তাই মায়াধীশ ঈশ্বরের শরণাগত হতে হয়। বেদান্তে অধ্যারোপের বিপরীত হল অপবাদ। মায়াজাল ছিন্ন করার প্রক্রিয়া হল অপবাদ। তবে মায়ামুক্তির সবথেকে সরল প্রণালী আমরা পাই গীতায় : ''মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥''—''যে আমার শরণাগত সে-ই এই দুরতিক্রম্য মায়াকে অতিক্রম করতে পারে।'' কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন, ''জীব যেন ডাল, জাঁতার ভিতর পড়েছে, পিষে যাবে। তবে যে কটি ডাল খুঁটি ধরে থাকে, তারা পিষে যায় না। তাই খুঁটি অর্থাৎ ঈশ্বরের শরণাগত হতে হয়। তাঁকে ডাক, তাঁর নাম কর তবে মুক্তি। তা নাহলে কালরূপ জাঁতায় পিষে যাবে।'' আমরা গান গাই,

''চতুর যে মীন সেই জানে মা,
জাল থেকে যে মুক্তি আছে,
তাই জেলে যখন জাল ফেলে সে
লুকায় জেলের পায়ের কাছে।''

শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছেন ঈশ্বরকে

আমমোক্তারি দিতে। বড়মানুষকে ভার দিলে কোনও চিন্তা থাকে না। কোন পথ দিয়ে তাঁর করুণা আমায় তাঁর দ্বারে নিয়ে যাবে সে তো তাঁর দায়িত্ব, আমি যেন সুখে দুঃখে বলতে পারি—তোমার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হোক। আমরা এমন কিছু ভক্ত দম্পতির কথা জানি, যাঁদের একমাত্র সন্তান উপযুক্ত বয়সে তাঁদের ছেড়ে অমৃতধামে চলে গেছেন, অথচ সেই আঘাত অতি অল্পদিনের মধ্যেই কাটিয়ে উঠে তাঁরা আরও গভীরভাবে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের শিষ্য গোবিন্দ ঘোষ অপূর্ব কীর্তন গাইতেন। রথযাত্রার সময় তাঁর সংগীত শুনে মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভুর ভাবসমাধি হয়ে যেত। গোবিন্দ ছিলেন মহাপ্রভুর প্রধান সেবক। কিন্তু একবার প্রভুর মুখশুদ্ধির জন্য একখণ্ড হরিতকি তিনি সঞ্চয় করে রেখেছিলেন বলে মহাপ্রভু তাঁকে বিবাহ করার নির্দেশ দেন, কারণ সঞ্চয় সাধুর ধর্ম নয়, গৃহস্থের ধর্ম। গোবিন্দ বিবাহ করেন এবং গোপীনাথের মূর্তি স্থাপন করে স্ত্রীর সঙ্গে অত্যন্ত ভক্তিভরে নিত্য সেবাপূজা করতে থাকেন। তাঁদের একটি পুত্রসন্তানও হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই অকালে তাঁর স্ত্রী এবং পুত্র একে একে শরীর ত্যাগ করে। শোকে, অভিমানে গোবিন্দ মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেন। তিনি আর গোপীনাথের পূজা করবেন না। তিনি তো বিবাহ করতে চাননি, সংসার করতে চাননি। তাহলে জোর করে এই বন্ধনে ফেলে আবার দুঃসহ শোকযন্ত্রণা ভোগ করানোর অর্থ কী? আর তাছাড়া তিনি এখন গৃহস্থ। তাঁর পারলৌকিক কাজ করবেই বা কে? হঠাৎ মন্দিরের ভেতর থেকে মধুর কণ্ঠস্বর শোনা যায়, ''তোমার একটা ছেলে চলে গেলে কি আর-একটা ছেলে না খেয়ে থাকবে? আমার যে খিদে পেয়েছে! আমায় খেতে দেবে না?'' অভিমানে গোবিন্দ বলেন, ''ঠাকুর, আমার ছেলে থাকলে তো অন্তত আমার মৃত্যুর পরে শ্রাদ্ধাদি কাজ করতে পারত! তুমি আমার কী করবে?'' ''ঠিক আছে, কথা দিলাম, আমিই তোমার শ্রাদ্ধের কাজ করব। এখন কি আমায় একটু খেতে দেবে?'' গোপীনাথের উত্তর শুনে এক নিমেষে গোবিন্দের শোকের ভার লাঘব হয়ে গেল। তিনি আনন্দে ছুটে চললেন মন্দিরের দিকে। পরিণত বয়সে গোবিন্দ ঘোষের দেহান্ত হলে অবাক হয়ে সবাই দেখল গোপীনাথের আঙুলে শ্রাদ্ধাধিকারীর কুশাঙ্গুরীয় এবং পরিধানে সাদা পোশাক। কোন সূক্ষ্ম সংসার-আসক্তিকে সম্পূর্ণ নির্মূল করার জন্য ভগবান তাঁর ভক্তশ্রেষ্ঠকে দুঃখের পথ ধরে নিয়ে গিয়ে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিলেন কে জানে?

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন, ''মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।/ মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥''—''তুমি আমাতে চিত্ত স্থির করো, আমায় ভজনা করো, পূজা করো, আমাকে নমস্কার করো। সত্য প্রতিজ্ঞা করে বলছি, এভাবেই তুমি আমাকে পাবে, কারণ তুমি আমার বড় প্রিয়।'' শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, ''ভক্তিই সার; ঠিক ভক্তের কোন ভয় ভাবনা নেই। মা সব জানে।'' এই মণিমুক্তাগুলিই তো আমাদের মায়াসমুদ্রে পারানির কড়ি। তিনি যে আমাদের ভবপারে যাওয়ার মন্ত্র শিখিয়ে দেওয়ার জন্য দেহ ধারণ করে এসেছিলেন করুণায়, কৃপায়। আমাদের প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন, ''হে ঈশ্বর, তোমার এই ভুবনমোহিনী মায়ার ঐশ্বর্য—আমি চাই না—আমি তোমায় চাই।'' আমরা যেন বলতে পারি :

''স্বরচিত লীলাগার, মনোহর এ সংসার,
সুখ দুঃখ লয়ে সদা নানা খেলা খেলিছ,
পূর্ণজ্ঞান দিবে তাই, জন্ম হতে সুখ নাই
দুঃখপথ দিয়া মোর করে ধরি চলিছ,
সফল নিষ্ফল হই, কভু বুদ্ধিহারা নই,
তোমারি প্রসাদে তুমি সদা মোরে রাখিছ,
তুমি গতি মোর, তাই স্নেহে মাগো পালিছ।''